Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.07

ক্ষমতার ইতিহাস

পৌলমী তালুকদার
সহকারী অধ্যাপিকা
দর্শন বিভাগ, খড়্গপুর কলেজ

সারাংশ

সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সর্বাধিক সমালোচিত ও প্রতিস্পর্ধী ধারণাগুলির মধ্যে অন্যতম হল ক্ষমতার ধারণা। ক্ষমতার ধারণাটি বিশেষ করে রাজনীতির সাথে সরাসরি যুক্ত হলেও সব ধরনের সামাজিক সম্পর্কের মধ্যেই তা বিদ্যমান। এই মর্মে ফুকো (১৯৬৯) বলেছিলেন যে, যেকোনো সম্পর্কই ক্ষমতার সম্পর্ক এবং তা সমাজের সকল ক্ষেত্রেই বিধৃত। এর কোনো নির্দিষ্ট উৎস মুখ নেই। ক্ষমতা তত্ত্বের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা গেছে ক্ষমতা শব্দটির দুটি পৃথক অর্থ রয়েছে। যাকে অবলম্বন করে প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত ক্ষমতার ধারণাগত বিবর্তনে মূলত দুটি ধারা পাওয়া যায়; সেই দুই ধারাকে যে শব্দযুগলের দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে তা হল "power over" এবং "power to"—প্রথমটি হল হল কোনো কিছু করার সামর্থ্যরূপ ক্ষমতা (power to) এবং দ্বিতীয় অর্থ হল ক্ষমতার ঊর্ধ্বস্থিতি (power over)। এই দুই প্রকার ক্ষমতার ধারণাকে কেন্দ্র করে চিন্তাবিদ্‌দের মধ্যে বিস্তর মতবিরোধ গড়ে উঠেছে। ক্ষমতার এই দুটি অর্থ পরস্পর বিরোধী। তবে ক্ষমতার পাশ্চাত্য তত্ত্বগুলিকে পর্যালোচনা করে দেখা যাবে "ক্ষমতার ঊর্ধ্বস্থিতি" রূপ আগ্রাসনী ক্ষমতার ধারণাটিই সবার্ধিক গুরুত্ব পেয়ে এসেছে। এই নিবন্ধে, আমি ক্ষমতা তত্ত্বের বিবর্তনের ঐতিহাসিক পটভূমি পর্যালোচনা করে দেখব ক্ষমতার বিবিধ ব্যাখ্যায় কাঠামোগত কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। প্রাচীন, মধ্যযুগীয়, রেনেসাঁর সময়ে প্লেটো, অ্যারিস্টটল, ম্যাকিয়াভেলি, হবস লক, রুশো, ম্যাক্স ওয়েবার, ডাল, এবং হান্না আরেন্ট প্রমুখের ক্ষমতার ধারণায় আপাত পরিবর্তন লক্ষ করা গেলও আমূল কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। ক্ষমতার আলোচনায় সামগ্রিকভাবে সকলের স্বাধীনতা, পারস্পরিক সম্পর্ক, ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের প্রাধান্য প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলির প্রসঙ্গ আসাটা প্রাসঙ্গিক হলেও এযাবৎ যত তত্ত্বই পাওয়া গেছে তাতে স্বাধীনতা এবং ক্ষমতায়নের মধ্যের যে অন্বয়ী সম্পর্ক থাকা উচিৎ ছিল তা এই ক্ষমতা-তত্ত্বগুলি সুনিশ্চিত করতে পারেনি। এই প্রবন্ধে সেই প্রেক্ষপটই বিশ্লেষণ করব।

সূত্রশব্দ : ক্ষমতা, আগ্রাসন, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, আধিপত্য

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.07

"ক্ষমতা" (power), এই প্রত্যয়টি বহুল চর্চিত ও সমালোচিত একটি ধারণা। ক্ষমতা সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত জীবনের এমন এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা মানুষের মনস্তাত্বিকতার সীমানাকে ছাপিয়ে গিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে মানবিক যাপনের প্রতিটি পরতে। এই ক্ষমতাকে আমরা নানান ভাবে বুঝে থাকি, যেমন দৈহিক ক্ষমতা, বৌদ্ধিক ক্ষমতা, ভালোবাসার ক্ষমতা, অর্থের ক্ষমতা, রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষমতা, বৈদ্যুতিক ক্ষমতা, আবার "ক" এর উপর "খ"এর কর্তৃত্বের ক্ষমতা, যারা সমাজে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা, অমর্যাদা করার ক্ষমতা, তথাকথিত দৈহিক ও মানসিকভাবে রোগগ্রস্থ ব্যক্তিবর্গের দ্বারা সমাজ পরিবর্তনকামী ক্ষমতা প্রভৃতি। এই বিভিন্ন ধরণের ক্ষমতার মধ্যে এমন কোনো সাধারণ বৈশিষ্ট্য নেই যার দ্বারা এগুলিকে একসূত্রে গাঁথা যায়। ফলে ক্ষমতার কোনো নিটোল সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়। তবে, জীবনের নানান বোঝাপড়া, বিশেষ পরিস্থিতি ও বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত সামাজিক সম্পর্কের কার্যকারিতার মাধ্যমে ক্ষমতার স্বরূপকে অনুধাবন করার চেষ্টা করা যেতে পারে। ক্ষমতার আভিধানিক অর্থ এযাবৎ যা আমরা পেয়েছি তা হল কোনো ঘটনা ঘটাবার সামর্থ্য। এ হল একপ্রকার যোগ্যতা যার দরুণ কোনো পরিবর্তন বা রূপান্তর ঘটানো যায়। এই অর্থে ক্ষমতা বস্তু ও মানুষ উভয়ের থাকতে পারে। কিন্তু যদি আমরা কেমব্রিজ অভিধান দেখি তাহলে আমরা ক্ষমতার অপর আরেকটি অর্থ দেখতে পাব। যেখানে ক্ষমতা হল সেই সামর্থ্য বা যোগ্যতা যা অপর কোনো ব্যক্তিকে বা ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং ক্ষমতাকে যদি মূল শ্রেণী হিসাবে কল্পনা করা যায় তবে নিয়ন্ত্রণের সামর্থ্য হল মূল শ্রেণীর অন্তর্গত একটি উপশ্রেণী। ফলতঃ যে বিষয়টি এর ভিতরে লুকিয়ে আছে, তাকে উদ্ঘাটন করলেই ক্ষমতার অন্য একটি চেহারার সন্ধান পাওয়া যাবে। নিয়ন্ত্রণ অর্থে ক্ষমতার ব্যাপৃতিই আজ বিশালাকার ধারণ করেছে। এইরূপ ক্ষমতার বৈশিষ্ট্য হল মানুষের উপর কর্তৃত্ব বা প্রতিপত্তি জাহির করা অর্থাৎ মানুষের যাপিত জীবন কেমন হবে তাকে নির্ধারণ করা। তাই ক্ষমতার মধ্যে একপ্রকার খবরদারী বা আস্ফালনধর্মী প্রবণতা রয়েছে। এক্ষেত্রে ক্ষমতার কোনোকিছু করার সামর্থ্যরূপ অর্থটি সংকীর্ণ হয়ে যায় শুধু নয়, এই অর্থে সামর্থ্যের প্রকৃত দ্যোতনাটি বাধিত হয়ে পড়ে। ক্ষমতার প্রাগুক্ত বৈশিষ্ট্যটিকে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, এই অর্থে ক্ষমতা মানুষ বা গোষ্ঠীকে বিভিন্নভাবে কাজ করতে পারার নানান সুযোগকে বন্ধ করে দেয়। একে বলা হয় ক্ষমতার প্রভাবশালিতা (power as impact), যাকে আমরা ক্ষমতার ঊর্ধ্বস্থিতি বা 'power over power' বলেও অভিহিত করে থাকি। ক্ষমতা তত্ত্বের ইতিহাসের দিকে তাকালে, ক্ষমতা তত্ত্ব কেন্দ্র করে যে মত পার্থক্য রয়েছে তা মূলত ক্ষমতার এই দুটি পৃথক অর্থকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে — একদিকে রয়েছে কোনো কিছু করার সামর্থ্যরূপ অর্থ (power to), অন্যদিকে রয়েছে ক্ষমতার ঊর্ধ্বস্থিতি (power over) রূপ অর্থ। ক্ষমতার এই দুটি অর্থ পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও পাশ্চাত্য দর্শনচিন্তায়

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.07

উভয়েরই প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। মূলস্রোতের সমাজ বিজ্ঞানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্ষমতার দ্বিতীয় অর্থটি অর্থাৎ ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণী চেহারাটি অধিক গুরুত্ব পেয়ে এসেছে। কিন্তু এইস্থলে যে সমস্যাটি ভীষণভাবে প্রকট হয়ে ওঠে তা হল এইরূপ ক্ষমতার সঙ্গে স্বাধীনতা ও ক্ষমতায়নের সমীকরণটি কীরূপে হবে? তাৎপর্য হল স্বাধীনতার প্রত্যয়টি মূলস্রোতে বহুলভাবে আলোচিত হলেও তা যে রূপে প্রকাশিত হয়েছে তাতে ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়াটি সার্বিক হয়ে উঠতে পারেনি। তাহলে কি বিকল্প ক্ষমতা ও স্বাধীনতার সম্বন্ধ অনুসন্ধানের চেষ্টা করা উচিৎ নয়? আমাদের মূল লক্ষ্য হল এমন এক ক্ষমতার বিন্যাসের খোঁজ করা, যেখানে ক্ষমতা, স্বাধীনতা ও ক্ষমতায়নের নতুন অনুস্যূত প্রতিচ্ছেদক সম্পর্কের সন্ধান পাওয়া যাবে। এযাবৎ কোনো তত্ত্বকাঠামোতে এই সম্পর্কের কোনো সুলুক সন্ধান পাওয়া যায়নি। এখনো পর্যন্ত যত প্রকারের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক তত্ত্ব পাওয়া গেছে প্রত্যেকটি তত্ত্বই কোনো না কোনোভাবে ক্ষমতার আধিপত্যকারী রূপেরই নামান্তর। পরবর্তীতে ক্ষমতার বিকিরিত আন্তর্জালিক চেহারা পাওয়া গেলেও সাম্যপ্রধান ও যূথবদ্ধশক্তি কাঠামোর স্পষ্ট রূপ পাওয়া যায়নি। এই যূথবদ্ধশক্তির দ্বারা সুষমশক্তি প্রতিষ্ঠা করতে গেলে স্ব-অপরের দ্বন্দ্বকে নিরসন করা চাই। তাও সফলভাবে নিরসন হতে দেখা যায়নি। ক্ষমতা-প্রতিরোধ-স্বাধীনতা-ক্ষমতায়নে 'অপরতা'র ধারণাটির নৈতিক বিনির্মাণও পূর্বের তত্ত্ব কাঠামোগুলিতে অমীমাংসিত থেকে গেছে, যার ফলে হিংসা ও আগ্রাসী বিচ্ছিন্নতা থেকে নিস্তার পাওয়া যায়নি এবং ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়াটি ব্যক্তির আন্তরিক ক্রিয়া হয়ে ওঠেনি। যুগের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতাতন্ত্রে ক্ষমতার বিন্যাসে যে যে রদবদল ঘটতে দেখা গেছে তাতে রাজতান্ত্রিক ক্ষমতার প্রভুত্ব থেকে সার্বভৌমত্বের ধারণা স্থান পেলেও উদারনীতিবাদ, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, ভোটাধিকার অর্জিত হলেও প্রশাসনিকতার প্রতিটি অংশেই থেকে গেছে ক্ষমতার আস্ফালন। ফলতঃ এমন এক ক্ষমতার বিন্যাসের খোঁজ করা উচিৎ যেখানে সামগ্রিকভাবে সকলের ক্ষমতায়ন ও স্বাধীনতার সম্পূর্ণ বিকাশের সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু কোনো সমস্যাই হঠাৎ করে আসে না। তার আগে থেকে তৈরি হতে থাকে তার প্রেক্ষপট। সমস্যার সমাধানপথ অনুসন্ধান করতে গেলে ক্ষমতা তত্ত্বের বিবর্তন ও ঐতিহাসিক পরিক্রমা করাটা প্রথমে প্রয়োজন। তাহলেই আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে যে কেন আজ আমরা এর পরিবর্তন চাইছি, কেন কোনো চিন্তন কাঠামোকে বিনির্মাণ করতে চাইছি। এই প্রবন্ধে আমরা শুধু ঐতিহাসিক পরিক্রমাতেই নিজেরদেরকে সীমিত রাখব। উদ্দেশ্য হল ফিরে দেখা ক্ষমতা তত্ত্বের বিবর্তনে ব্যক্তি মানুষের অবস্থান কিরূপ ছিল, যা তার ক্ষমতায়নের পথকে কণ্টকিত করেছে।

ক্ষমতার বিবর্তন

ক্ষমতা-রাজনীতি-রাষ্ট্রচিন্তা-সমাজ-ব্যক্তি ইত্যাদি বিষয়ের দার্শনিক তাত্ত্বিকীকরণের সূচনা হয় প্লেটো-অ্যারিস্টটলের সময় থেকে। তাঁদের আগে পশ্চিমী রাষ্ট্রচিন্তায় ক্ষমতার বিষয়টিকে ঘিরে

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.07

বিশেষভাবে আলোচনা হতে দেখা যায়নি। মানুষের সামনে রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাকে প্লেটো-অ্যারিস্টটলই সুস্পষ্ট ও বিবিক্তভাবে তুলে ধরেন। সমসাময়িক অবস্থা তাঁদের উভয়ের রাষ্ট্রচিন্তার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছিল।

খ্রিস্টপূর্ব ৪৩১ সাল নাগাদ শুরু হল পোলেপনেসীয় যুদ্ধ। স্পার্টা ও এথেন্স এর মধ্যে তিক্ততা এই সময় চরম পরিণতি নিল। প্রতিটি নগরের অভ্যন্তরীণ গন্ডগোল, রাষ্ট্রদ্রোহিতা, বিশ্বাসঘাতকতা ও অসৎভাবের অনুপ্রবেশ ঘটল। ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান ক্রমশ বাড়তে লাগলো, নগর রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অবিরত সংগ্রামের পরিস্থিতি দেখা দিতে লাগল। এই অস্থিরতার সময়ে প্লেটো-অ্যারিস্টটল তাঁদের রাষ্ট্রচিন্তাকে গঠন করেন। এই অস্থিরতা ও অবক্ষয়ের প্রতিরোধ হিসাবে তাঁরা তাঁদের তত্ত্বকে তুলে ধরার চেষ্টা করেন, যদিও তাঁদের রাষ্ট্রচিন্তা তৎকালীন সামাজিক কাঠামোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সমাজ সেই সময় বিভক্ত ছিল তিনটি শ্রেণীতে। (১) যে কোনো প্রকার অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া দাস শ্রেণী, (২) সামাজিক অধিকারভোগী কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারবিহীন বিদেশী সম্প্রদায় এবং (৩) একচেটিয়া আধিপত্যকারী রাজনৈতিক অধিকারভোগী নাগরিক শ্রেণী, এই শ্রেণী আবার অভিজাত ও সাধারণ এই দুই ভাগে বিভক্ত। এই দুই শ্রেণী চির বিবাদমান। প্লেটো-অ্যারিস্টটল আমূল পরিবর্তনকামী না হওয়ায়, তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল এই দুই শ্রেণীর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা।

আমরা প্রত্যেকে এ বিষয়টি সম্পর্কে অবগত যে, রাজনৈতিক তত্ত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা হল প্লেটোর *রিপাবলিক*। প্লেটো ব্যক্তিজীবনে নৈতিকতার প্রসঙ্গকে উদ্ভাবন করে তাঁর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের আড়ালে রাজনৈতিক আদর্শকে মুখ্য আলোচনার বিষয় করে তুলেছিলেন। কোনো ব্যক্তির মধ্যে যদি ইতিবাচক, উৎকর্ষসূচক নৈতিক গুণ থাকে তাহলে তার আর আলাদা করে ন্যায্য নীতির বা just principle-এর প্রয়োজন হয় না। এই প্রকার মতবাদে চরমভাবে বিশ্বাসী ছিলেন প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক প্লেটো। তিনি মনে করতেন, নৈতিক সদ্গুণগুলিকে নিয়ে কেউ জন্মায় না, তা সহজাত নয়। নৈতিক সদগুণ গুলিকে শিক্ষণ, অভ্যাস, চর্চা ও অনুশীলনের মাধ্যমে আয়ত্ত করতে হবে। এ প্রসঙ্গে প্লেটো বলেছেন, কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ তাকে আমরা ছোটবেলা থেকে পঠন-পাঠনের মাধ্যমে আয়ত্ত করি। তিনি আরো বলেন যে প্রাথমিক পর্যায়ে এই স্থলে অভ্যাস তৈরি প্রয়াস চলে মাত্র, কিন্তু তার ভিতরে তখনও যুক্তি দিয়ে বিচার করে গ্রহণ করার তত্ত্বভূমিটি তৈরি হয় না। এটা যতক্ষণ না পর্যন্ত হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু তার শেখাটা সম্পূর্ণ হবে না এবং তার সেই অভ্যাসও আমৃত্যু থাকবে, তাও বলা যায়না। তাই সদ্গুণগুলিকে স্থায়ীরূপ দিতে হলে শিক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে অর্থাৎ শিশুটিকে ধীরে ধীরে জানতে হবে সত্য কোনটা। এই শেখাটা অর্থাৎ সত্যের জ্ঞান আমাদের দেবে দার্শনিকরা। তারা যেগুলিকে সদগুণ বলে চিহ্নিত করে দেবেন, সেগুলিই সদগুণ বলে বিবেচিত হবে। প্লেটো এই সূত্র ধরে বলেছেন, প্রত্যেক

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.07

মানুষের একটি আত্মা বা soul আছে। এই "soul" পদটিকে তিনি পারিভাষিক অর্থে গ্রহণ করেছেন। এই soul-এর তিনটি অংশ; সেগুলি হল (১) ইন্দ্রিয়গত প্রবৃত্তি (appetite) (২) উদ্দাম (spirit) এবং (৩) বুদ্ধিবৃত্তি (reason)। আত্মার তিন অংশ প্রথমেই শিক্ষিত থাকে না, কিন্তু তাকে কর্ষণ করে অর্থাৎ তাকে সঠিক পথে নিয়ে যেতে হয়। যদি তাকে শিক্ষিত না করা যায় তাহলে সেটি বিক্ষিপ্ত হয়ে যেতে পারে, তখন অংশগুলি অসৎ কাজে নিজেকে লিপ্ত করে ফেলতে পারে। তাই সুশিক্ষিত হওয়া খুবই দরকার, কারণ সুশিক্ষিত হতে না পারলে নৈতিকতা আয়ত্ত করা যাবে না এবং ব্যক্তির মধ্যে বিপরীত সত্তা ফুটে উঠতে পারে অর্থাৎ সৎসাহস দুঃসাহসে পরিণত হয়ে যেতে পারে। ইন্দ্রিয়গতপ্রবৃত্তিকে শিক্ষিত করলে সংযমকে পাওয়া যায়, সদ্গুণ রূপে উদ্দামকে শিক্ষিত করলে সাহস লাভ করা যায়, তৃতীয় অংশ যুক্তি, তাকে শিক্ষিত করতে পারলে প্রজ্ঞাকে আয়ত্ত করা যায়। প্লেটোর মতে ন্যায়পরায়ণ হতে গেলে প্রতিটি অংশকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করতে হবে। এদের মধ্যের যে আন্তঃসম্পর্ক আছে তাকে বিরোধ মুক্ত হতে হবে। এই অংশগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য থাকাটা ন্যায়পরায়নতার আবশ্যিক শর্ত। একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে এই অংশগুলি সমান মর্যাদা সম্পন্ন নয়। অংশগুলির মধ্যে স্তরবিন্যাসের তারতম্য আছে (বুদ্ধি-উদ্দাম-ইন্দ্রিয়গতপ্রবৃত্তি)। প্লেটোর মতে প্রজ্ঞার দ্বারা যাকে সত্য বলে জানা হয়েছে তার নিরিখেই সাহস ও সংযমকে চালিত হতে হবে। এই ক্রমে যদি পূর্ণ বিকাশ ঘটে তবেই সত্য প্রকাশিত হবে। ব্যক্তির মত রাষ্ট্রেরও এইরকম তিনটি অংশ আছে। তাকে সুপরিচালিত করতে প্রয়োজন অভিভাবক বা দার্শনিকের। তাঁরা যুগপৎ জ্ঞান ও সঠিক বিশ্বাসের অধিকারী, তারাই একমাত্র সত্যদ্রষ্টা ও শুভাশুভ সম্পর্কে অবগত। এদের কথা অনুযায়ী প্রশাসক, সাধারণ লোক সত্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে। যখন রাষ্ট্রের এই তিনটি অংশ অভিভাবক, প্রশাসক এবং প্রজাদের মধ্যে ঐকতান থাকবে তখনই রাষ্ট্র ন্যায়পরায়ণ হবে। ফলে সদগুণ সমন্বিত একটি নৈতিক সর্বাঙ্গ সুন্দর মানুষের সেই শিক্ষার ছাপ পড়বে সমাজ ও রাষ্ট্রে।

এই মর্মে প্লেটো তিনটি শ্রেণী সমন্বিত আদর্শ নগর গঠনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সেগুলি হল (১) অভিভাবক, যারা হলেন দার্শনিক, তারাই রাষ্ট্রপরিচালক, (২) যোদ্ধা, তারা বহিঃশত্রুর আক্রমণকে প্রতিহত করে, প্রয়োজনে অন্য রাষ্ট্র আক্রমণ করে, এই শ্রেণীর ব্যক্তি সহজেই অভিভাবক শ্রেণীর অন্তর্গত হতে পারে এবং দ্রুততার সঙ্গে শাসন কৌশল তাদের আয়ত্ত করতে পারে। (৩) কারু শ্রেণীর বা উৎপাদক শ্রেণী। প্লেটোর মতে এই শ্রেণীকরণটি ন্যায়সঙ্গত ও স্বাভাবিক। প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাভাবিক ক্ষমতা পৃথক পৃথক এবং স্বতন্ত্র, সেই জন্য প্রত্যেকেই এক কাজ করতে পারে না। রাষ্ট্রের মানুষ তার শ্রেণী অনুযায়ী নির্দিষ্ট ভূমিকা পালনে তৎপর এবং কোনো সময়েই অন্য শ্রেণীর মানুষের জন্য নির্ধারিত কাজে হস্তক্ষেপ করে না। এটি হল এমন এক শাসনব্যবস্থা, যেখানে অভিভাবক শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করেন, যোদ্ধা যুদ্ধ করেন এবং কারুজীবী গোটা সমাজের নানাবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন করেন। প্রত্যেকেই তারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে চূড়ান্ত

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.07

ও অপরিবর্তনীয়। শাসক গোষ্ঠীর ক্ষমতা যে একক ভাবে সংরক্ষিত হবে তা বিনা প্রশ্নে নির্ধারিত হয়। প্লেটোর রাজনৈতিক চিন্তার মধ্যে অভিভাবকের কথাই শেষ কথা। সেই জন্যে তিনি অভিভাবককে বিশেষ গুণের অধিকারী হিসাবে স্থাপন করেছেন। অভিভাবকদের নৈতিক ও বৌদ্ধিক উভয় দিক থেকেই সেরা ও শ্রেষ্ঠতম হিসাবে ঘোষণা করায় এটা স্পষ্ট যে তিনি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন না। সুতরাং, প্লেটোকৃত শ্রেণীবিভক্ত সমাজব্যবস্থায় ক্ষমতা সুষমভাবে বন্টিত নয়। ফলতঃ বলা যেতে পারে সামাজিক উচ্চ-নীচ থাকবন্দী বিন্যাসের সর্বপ্রথম প্রবক্তা হলেন প্লেটো।

প্লেটোর মত অ্যারিস্টটলও আদর্শ সম্পর্কে আগ্রহী ছিলেন, যা তিনি তাঁর *পলিটিক্স* নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। আদর্শ রাষ্ট্র ও সমাজের রূপরেখা দেওয়াই তার লক্ষ্য ছিল। পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁর রাষ্ট্রচিন্তা নিঃসন্দেহে অনন্যতার দাবী রাখে। তিনি রাষ্ট্রনৈতিক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা সুস্পষ্টভাবে অনুভব করেন এবং ব্যক্তি জীবনের সঙ্গে রাষ্ট্র অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এটাও সুস্পষ্ট ভাবে আলোচনা করেন। তিনি তাঁর *পলিটিক্স* গ্রন্থের প্রথমেই বলেছেন রাজনৈতিক কর্তৃত্বের সমান কোনো কর্তৃত্ব নেই। প্রভু তার দাসের উপর যা করতে পারেন বা পরিবার প্রধান তার পরিবারের সদস্যদের উপর যে প্রভুত্ব করতে পারেন, এই সবের থেকে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব গুণগত দিক থেকে পৃথক। রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ঐকান্তিক হতে পারে না এবং তা শর্তাধীন এই অর্থে যে, যেকোনো ভাবেই হোক না কেন আনুগত্য প্রদানকারী ব্যক্তিবর্গের কাছে তাকে গ্রহণযোগ্য হতে হবে। তবেই রাষ্ট্র বৈধীকরণ হওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে পারবে। অ্যারিস্টটল মনে করেন, এই ভাবে গঠিত হলে সেই রাষ্ট্রের নির্দেশ জনগণ মানতে বাধ্য। মঙ্গলময় জীবনযাপনের লক্ষ্যকে সুনিশ্চিত করার কর্তব্যকে এড়াতে কেউ পারে না এবং রাষ্ট্র যেহেতু কল্যাণময় লক্ষ্যের প্রতি উৎসর্গীকৃত সেহেতু রাষ্ট্রনৈতিক কর্তৃত্বকে মান্যতা দিতে মানুষ বাধ্য। এইভাবে তিনি রাষ্ট্র এবং ব্যক্তির মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেন। তবে প্লেটো-আরিস্টটলের দর্শন অবশ্যই অবক্ষয়ী নগর রাষ্ট্রকে পতনের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেনি।

মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রচিন্তা

টিউটনিক আক্রমণকারীদের হাতে রোমান শক্তি পরাহত হওয়ার পর ইউরোপের ইতিহাস অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যায়। এই অন্ধকার যুগে খ্রিস্টান ধর্ম আলোকবর্তিকা হয়ে আসে, বস্তুতপক্ষে বর্বরদের আক্রমণের ফলে পুনরায় অসভ্য হয়ে যাওয়া অবস্থার সুযোগে খ্রিস্টধর্ম নিজের সুবিধার জায়গাটি বেশ ভালোভাবেই গুছিয়ে নিতে শুরু করে। তবে এই ধর্ম মানুষকে অবশ্যই সংস্কৃতিবান একটি জীবনধারা উপহার দিয়েছিল। প্রাথমিক অবস্থায় আধ্যাত্মিক কর্তৃপক্ষ ও রাষ্ট্রনৈতিক কর্তৃপক্ষ উভয়ের মধ্যে চমৎকার সম্পর্ক ছিল। রোমের পোপ পার্থিব ক্ষেত্রে বাইজান্টাইনের শাসকের কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তার কারণ হল, তার পক্ষে তার

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.07

প্রভাবাধীন এলাকায় তাঁর ধর্ম সম্প্রচার করার জন্য, সমর্থনের দরকার ছিল। অর্থাৎ রাজনৈতিক কর্তাদের সঙ্গে বৈরিতা করলে তাঁদের আখেরে ক্ষতি এটি তাঁরা বুঝেছিল। অন্যদিকে নতুন রাষ্ট্রনৈতিক রাজাদেরও পোপের অনুমোদন বা মঞ্জুরি প্রয়োজন ছিল অর্থাৎ দুই পক্ষেরই নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য দুজনকে দরকার ছিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ক্ষমতার একছত্র অধিপতি কে হবে তা নিয়ে বিবাদ চরমে উঠতে থাকে।

১০৯৫ খ্রিস্টাব্দে শুরু হলো ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ, মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে ১২৯১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চলল এটি। এই ধর্মযুদ্ধ ইউরোপীয় সমাজে এক লক্ষণীয় পরিবর্তন নিয়ে এলো। পরিবর্তনমান এই যুগের প্রারম্ভে ইউরোপের প্রধান শহরগুলিতে অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যে আর বিনিময় প্রথা রইল না, তার পরিবর্তে শুরু হল অর্থের বিনিময়ে কেনা বেচা। টাকার ব্যবহার বৃদ্ধিতে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারিত হল। এভাবে দ্বাদশ শতাব্দীর পর স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রাম কেন্দ্রিক সরল অর্থনীতি ইউরোপীয় সমাজ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে শুরু হল সুস্পষ্টভাবে মুদ্রা কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক সমাজ। ক্রমবর্ধমান ব্যবসায়িক ক্রিয়াকর্মের ফলে দ্রুত অনেক শহর গড়ে উঠল। এসব শহরের বাসিন্দা হল উদীয়মান বণিক শ্রেণী, ভবিষ্যতের বুর্জোয়া শ্রেণী। ভূমিভিত্তিক সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছিল স্থানু প্রকৃতির, একটা নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ ছিল। শহরগুলিতে নতুন নতুন শিল্প কেন্দ্র গড়ে উঠতে লাগলো আর এই শিল্প কেন্দ্র সমূহে গতিশীল অর্থনৈতিক ক্রিয়া-কলাপ চালু হল। এ সমস্ত উদীয়মান বুর্জোয়া সম্প্রদায় এক নতুন প্রকৃতির বিত্ত নিয়ে এলো। তা হল অর্থ (money); এবং তা সক্রিয় ও গতিশীল হবার দরুণ ভূমিগত বিত্তের চেয়ে প্রভাব বিস্তারের পক্ষে অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠলো। এটি প্রচলিত সামন্ত সমাজের শক্তি বা ক্ষমতা বিন্যাসের দিক থেকে একটি বিপদ হিসাবে দেখা দিল। এই সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক কাঠামো উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে আদৌ সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। শহরবাসী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের নিকট স্বাধীনতা ছিল অত্যন্ত জরুরী এবং সেজন্যই স্বভাবত সামন্তযুগে অনমনীয় নিয়ন্ত্রণ সমূহ তাদের কাছে অসহনীয় ছিল। নতুন পরিবেশ যেখানে নতুন ধরনের যে অর্থনীতি গড়ে উঠেছে বা আবির্ভাব হচ্ছে তা সামন্ত সমাজকে চ্যালেঞ্জের মধ্যে ফেলেছিল। এতদিন চার্চ সামন্ত সমাজে অগ্রগামী সংগঠন হিসাবে কাজ করেছে, সেই চার্চ পূর্বের মতো আর শক্তিশালী রইল না। এই সংগঠনের শক্তির দ্রুত ক্ষয় হতে শুরু করলো। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামে উদীয়মান বুর্জোয়া সম্প্রদায় রাজকীয় শক্তি সহায়তা গ্রহণ করে এবং রাজাও দেখলেন এই নতুন সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংযুক্ত হলে নিজের সুবিধা আছে। একটি গতিশীল অর্থনীতির আবির্ভাব এবং নতুন একটি শ্রেণীর অভ্যুদয় গোটা সমাজে এক ধর্মনিরপেক্ষ প্রভাব ছড়িয়ে দিল। নতুন সমাজ তার নিজের সুবিধার জন্য কেন্দ্রীভূত ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির উপর স্বেচ্ছায় বশ্যতা স্বীকার করে নিতে আগ্রহ দেখালো। পঞ্চদশ শতকের প্রথমে অবশ্য পরিবর্তনের গতির চিহ্ন পরিস্ফুট হয়েছিল। অন্যদিকে বণিক শ্রেণী তার নিজের স্বার্থে উৎপাদন করতে লাগল। প্রচলিত উৎপাদন পদ্ধতিতে বড় মাপের

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.07

পরিবর্তন নিয়ে এলো। কাঁচামাল এবং যন্ত্রপাতি সরবরাহ করবে যারা তাদের পরিশ্রমের জন্য বেতন দেওয়া হবে যতটুকু না দিলে নয় এবং উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী যত অধিক মূল্যে ইচ্ছে বিক্রয় করবে। পণ্য উৎপাদনে তার পুরো পারিশ্রমিকের অংশমাত্র মূল্য দেওয়া হবে, বাকি উদ্বৃত্ত শ্রম বুর্জোয়া শ্রেণী আত্মসাৎ করবে। কারিগরদের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত করার জন্য যে অর্থ সে বিনিয়োগ করবে সেটা তার মূলধন বা ক্যাপিটাল, এই মূলধন উদ্বৃত্ত মূল্যের মাধ্যমে তাকে মুনাফা যোগাবে। এইভাবে মূল্যের উপর প্রতিষ্ঠিত পুঁজিতান্ত্রিক বা ক্যাপিটালিস্ট উৎপাদন পদ্ধতি কালক্রমে ইউরোপের অর্থনীতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসাবে চিহ্নিত হল। ইউরোপের এই নয়া জীবনধারাকে অনুসরণ করে জন্ম নিল নতুন ক্ষমতার নীতি। এই নীতিতে কুক্ষিগত ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটল মাত্র, বিন্যাসের কোনো পরিবর্তন হল না।

নবজাগরণের যুগ

রেনেসাঁস, ইটালিতে সর্বপ্রথম বিকাশ লাভ করে। গোটা পঞ্চদশ শতক ধরে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিশীল চিন্তার প্রকাশ দেখা যায় এই ইটালীতে। ইউরোপীয় রেনেসাঁস ইউরোপের সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এটি কোনো আকস্মিক ঘটনা বা খামখেয়ালি ব্যাপার নয়। বলা বাহুল্য যে, ইউরোপীয় রেনেসাঁ কার্যত পরিবর্তনমান সামাজিক শক্তিসমূহের প্রয়োজনপ্রসূত। যার ফলে সামন্ত ব্যবস্থার ক্ষয় হয় এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে। এই নতুন অর্থনৈতিক ক্রিয়া-কলাপ পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে ইউরোপের এক নতুন সমাজ গড়ে উঠেছিল। শ্রেণী অর্থনৈতিক সাফল্যের জন্য প্রয়োজন ছিল এক নতুন মূল্যবোধের। নবজাগরণ ছিল মানুষের জাগরণ, এই সময় স্ব-শাসন, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও বিভিন্ন সম্ভাবনার সূচনা হয়। এক কথায় এই আন্দোলনের ফলশ্রুতি হচ্ছে এক মহান মানব আবিষ্কার। সাহসী এক ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত হওয়ার জন্য নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা এবং ভাগ্যের উপর নির্ভর না করে বরং মানুষ নির্ভর করবে তার দুটো হাতের উপর - এই ছিল তখনকার অঙ্গিকার। স্বাভাবিকভাবে রেনেসাঁস জীবন সম্পর্কে ধর্মনিরপেক্ষ (secular) ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করল।

এই পর্বে, প্রথম যাঁর নাম আমরা পাই তিনি হলেন ষোড়শ শতাব্দীর চিন্তাবিদ নিকোলো ম্যাকিয়াভেলি। নিকোলো ম্যাকিয়াভেলির জন্ম এবং কর্ম এমন এক সময় হয় যখন ইটালিতে রেনেসাঁস তার গৌরবময় বিন্দুতে অবস্থান করছিল। তিনি ইতালির রেনেসাঁর সন্তান, তা শুধুমাত্র কালানুক্রমিক দিক থেকেই নয়, প্রধানত বৌদ্ধিক প্রভাবের প্রতিনিধিত্বের করার জন্য। তাঁর *দি প্রিন্স* ও *দি ডিসকোরস অন লিভি* গ্রন্থদ্বয়ে বস্তুত ইউরোপীয় রেনেসাঁর অন্তঃসার নিহিত আছে। ওঁর লেখনী হল এক একটি ধ্রুপদী গ্রন্থ। ম্যাকাইভেলির প্রথম বই *The Prince* প্রকাশ পায় ১৫৩২ সালে। তিনি এই গ্রন্থে রাষ্ট্রশক্তির ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেন। সেই সময় প্রায় সকল দার্শনিক ও রাষ্ট্রচিন্তকগণ মনে করতেন যে নৈতিক ভালোত্বের সঙ্গে আইনি

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.07

কর্তৃত্বের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। ম্যাকিয়াভেলির কল্পিত মানুষ নিজের ভাগ্যের নিয়ন্তা। ম্যাকিয়াভেলি মনে করেন যে এমন কোনো নৈতিক ভিত্তি নেই যার দ্বারা আমরা আইনী ক্ষমতা ও বিধি নিষিদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে পার্থক্য করতে পারি। বরং কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা ভাবে একই পর্যায়ভুক্ত। যার ক্ষমতা আছে, তার অধিকার আছে ক্ষমতাকে জাহির করার বা অনুশাসন করার। ভালোত্বের দ্বারা ক্ষমতাকে বিচার করা যায় না। মানুষ ভালোত্বের জোরে কর্তৃত্বশালী হয়ে উঠে এমনটা নয়। ম্যাকিয়াভেলির উদ্দেশ্য ছিল নৈতিকতা ভিত্তিক ক্ষমতা তত্ত্ব থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা তত্ত্বকে পৃথক করে দেখা। রাজনৈতিক ক্ষমতাকামীরা কীভাবে ক্ষমতাকে অর্জন করবেন এবং তাকে কীভাবে কায়েম রাখবেন এই ছিল তাঁর আলোচনার প্রধান প্রতিপাদ্য। সুতরাং বলা যেতে পারে ম্যাকিয়াভেলির কাছে বিধিসম্মত ন্যায্য অধিকার সমন্বিত শাসন ব্যবস্থা বলতে বোঝানো হয় কীভাবে ক্ষমতাকে করায়ত্ত্ব করে রাখা যায় বা রাখা হয় (possession of power) তার পাঠ।

ইতালীয় রেনেসাঁসের সাফল্য ও ব্যর্থতার সংযোগ বিন্দুটিতে ম্যাকিয়াভেলি তার বক্তব্য উপস্থাপিত করেছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন যে, একটি শক্তিশালী জাতিরাষ্ট্র গড়ে তুলতে হবে, তার জন্য তিনি বুর্জোয়া শ্রেণীর সামাজিক বিকাশের পক্ষে অনুকূল একটি রাজনৈতিক আবহাওয়া গড়ে তুলে ইতালীয় রেনেসাঁকে তার রাজনৈতিক পূর্ণতার দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। ম্যাকিয়াভেলির ধারণা অনুযায়ী শক্তির উৎস শক্তিতে নিহিত এবং একে নৈতিক দিক থেকে বৈধতা নিষ্প্রয়োজন, কারণ নৈতিকতা বা মরালিটি বাস্তব অবস্থার সঙ্গে একেবারেই অসামঞ্জস্যপূর্ণ। শক্তি অর্জনই হচ্ছে অন্তিম লক্ষ্য। কারণ, বেশিরভাগ মানুষ স্বভাবত অকৃতজ্ঞ, স্বার্থপর এবং অনেক স্থলেই বিশ্বাসের অযোগ্য, নিজস্বার্থ সংক্রান্ত উদ্দেশ্য অন্বেষণে ব্যস্ত। ব্যক্তি মানুষের নিজ স্বার্থ অন্বেষণের এই প্রয়াস অধিকাংশ সময়েই সমাজের স্থিতি ও নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে। ম্যাকিয়াভেলি মনে করেন মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শক্তি ছাড়া কোনো বিকল্প হতে পারে না। শক্তিই সর্বোচ্চ কল্যাণ, সে জন্য তিনি যতখানি শক্তিমান হওয়া সম্ভব শাসককে ততখানি শক্তিমান হওয়ার দরকার। তিনি মনে করেন যে এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য যে কোনো পন্থাই শাসক গ্রহণ করতে পারেন। নৈতিক বা ধর্মীয় কোনো নিয়ন্ত্রণ শাসক গ্রাহ্য করবে না, ন্যায়পরায়ণ না হওয়া অথবা নিষ্ঠুরতা ও লজ্জা ইত্যাদি তোয়াক্কা করা চলবে না। শাসক কোনোক্রমেই অন্য ব্যক্তিকে শক্তিমান হওয়ার সুযোগ দেবে না। তিনি নিজে একাই সমস্ত শক্তির অধিকারী হবেন। সেই জন্য সামগ্রিকভাবে জনসাধারণের সমর্থন লাভের প্রয়োজনিয়তা আছে, মানুষ তাকে ভালোবাসবে ও ভয় পাবে - এই দুইয়ের মধ্যে শেষোক্ত অর্থাৎ শাসিতের মনে ভীতির মনোভাব যেন প্রীতির মনোভাবের উপরে ওঠে এ বিষয়ে শাসককে সজাগ থাকতে হবে।

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.07

বুর্জোয়া রাজনীতি

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে থমাস হবসের মতাদর্শ সগৌরবে প্রকাশ পায়। তাঁর তত্ত্ব সর্বৈবভাবে আধুনিকতার দাবী রাখে, ম্যাকাইভেলির সামরিক শক্তিকেন্দ্রিক তত্ত্ব থেকে। এই তত্ত্বে যৌক্তিকভাবে ও সূক্ষ্মভাবে দেখানো হয়েছে যে কিভাবে একজন ক্ষমতাকে বোঝে বা ক্ষমতা পরিমাপক মানদন্ডগুলি কি?

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দিকে সামাজিক পরিবর্তন সুস্পষ্ট হল। যখন বুর্জোয়া সম্প্রদায় পরিষ্কারভাবে গণতান্ত্রিক শ্রেণীর ভূমিকা গ্রহণ করল এবং যথেষ্ট বিত্ত ও প্রভাবের অধিকারী হয়ে উঠে রাষ্ট্রনৈতিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করল, তখন এই রাষ্ট্রনৈতিক উচ্চাশা অবধারিতভাবে রাজন্য বর্গের সঙ্গে সংঘর্ষের সূচনা করল। অর্থনৈতিক ক্ষমতা দখলের চেষ্টা অবশ্য বুর্জোয়া শ্রেণীর অর্থনৈতিক স্বার্থের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। বুর্জোয়া শ্রেণী রাজনৈতিক কর্তৃত্বের এলাকায় অনুপ্রবেশ করে সমগ্র রাষ্ট্রশক্তিকে ধনতন্ত্রের স্বার্থে সুবিধাজনক মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করতে চাইল।

১৬৫১ সালে প্রকাশিত হবসের *লেভিয়াথান* গ্রন্থে আমরা সর্বপ্রথম বুর্জোয়া সমাজ এবং রাজনীতির তথ্য উপস্থাপনের আন্তরিক প্রয়াস লক্ষ্য করি এবং সেই জন্যেই তিনি আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক হিসাবে স্বীকৃত। পিউরিটান বিপ্লবের পর ইংল্যান্ডে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৫৮৮ সালে, যে বছর স্প্যানিশ আর্মাডা পরাজিত হয়, সেই বছরেই হবস জন্মগ্রহণ করেন। উদীয়মান বুর্জোয়ারা যাতে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সজীব থাকে, এটাই হল তাঁর মনোযোগের প্রধান বিষয়। এই চিন্তার আলোকে হবসের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা গড়ে ওঠে।

হবস ক্ষমতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন ক্ষমতা হল ব্যক্তির বর্তমান অবস্থার দ্বারা ভবিষ্যতের মঙ্গলকে অর্জন করা (present means to obtain some future apparent good)[ii]। হবসের এই ক্ষমতার সংজ্ঞায় যেদিকটি বিশেষভাবে লক্ষনীয় তা হল এই তত্ত্বে ব্যক্তির উপায় ও তার অভীষ্ট লক্ষ্যের মধ্যে একটি নিবিড় সম্পর্ক আছে। এই মর্মে প্রত্যেক মানুষ কোনো না কোনো ভাবে নিয়ন্ত্রিত। হবসের মতে মানুষ যদি নীতি মেনে তার নিজের কাজ করে চলে তবে তার দ্বারা কেউ আঘাতপ্রাপ্ত বা ক্ষতিগ্রস্থ হয় না। নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি আসে বর্তমান বাস্তবিক পরিস্থিতি থেকে। প্রায়শই দেখা যায় নিজ কাঙ্খিত মঙ্গল পেতে কারো না কারোর ক্ষতি সাধিত হচ্ছে বা অপরের ক্ষতি সাধন করতে হচ্ছে। তাই নিজের অথবা অপরের ইচ্ছা-অনিচ্ছা সবকিছু পড়ে যায় ক্ষমতার উপায় রূপে। এসব ব্যতিরেকে মানুষের পক্ষে তার নিজের অভীষ্ট মঙ্গলে তথা লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব হয় না। তাই বলা যায় নিজের ক্ষমতা আসে অপরের ক্ষমতার নিরিখে। হবস তাঁর *লেভিয়াথান* গ্রন্থে বলেছেন, যদি দুজন মানুষের একই চাহিদা বা একই কাম্যবস্তু থাকে, আর যদি উভয়ের কাছে তা সুখপ্রদ হয়, তাহলে তারা পরস্পর পরস্পরের শত্রুতে পরিণত হবে এবং সর্বশেষে লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার উদ্যমটাই নষ্ট হয়ে যাবে অথবা

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.07

একের দ্বারা অপরকে দমন করা হবে।[iii] সুতরাং নিজের আকাঙ্খিত বস্তুকে পেতে হলে অপরকে দমন, অপদস্থ বা হেনস্থা করতে হবে।

হবসের ক্ষমতা তত্ত্বকে কোনো কিছু করার সামর্থ্য অর্থে বুঝতে গেলে সেই বোঝাটা সম্পূর্ণ হবে না। কারণ তিনি ক্ষমতার সংজ্ঞায় বলেছেন যে - বর্তমান থেকে কাঙ্খিত ভবিষ্যতের মঙ্গল প্রাপ্তির জন্য ক্ষমতাকে কাজে লাগানো হয় অর্থাৎ কোনো কিছু করার ও পাওয়ার জন্যই ক্ষমতা। ক্ষমতাকে বোঝার জন্য তিনি বলেছেন - প্রত্যেক ব্যক্তি আত্মরক্ষার জন্য অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। সমস্ত সামাজিক সম্পর্কে দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ বা বিপ্লব ইত্যাদির মধ্যে নিজ অবস্থানকে টিকিয়ে রাখতে গেলে ক্ষমতাবান হয়ে ওঠাটাই প্রয়োজনীয়। হবস মনে করেন যে যদিও প্রত্যেক মানুষের সমান ক্ষমতা আছে, কারোর অপরের থেকে বেশি ক্ষমতা থেকে না, এতৎসত্ত্বেও আন্তর্ব্যক্তিক চাহিদা বা কামনাকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্ব ও বিবাদের সূচনা হয়। এইপ্রকার অবিরাম অশান্তি, প্রতিযোগিতা মানুষকে বিপন্ন করে তোলে। কালক্রমে মানুষের নিরাপত্তার স্বার্থে তাদেরকে পৌরজন সম্বন্ধীয় সমাজ (civil society) গড়ে তুলতে হয়। এই পৌরজন সম্বন্ধীয় সমাজগুলি সার্বভৌম ক্ষমতার দ্বারা চালিত হয়, যা সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হবে। তাই অনেক সময় বলা হয় হবসের ক্ষমতা তত্ত্বকে বুঝতে হলে প্রথমে বুঝতে হবে মানুষে মানুষে বিবাদ, সংগ্রাম ও প্রতিযোগিতাকে। *লেভিয়াথানের* এক জায়গায় হবস বলেছেন- একজনের সন্তুষ্টি নির্ভর করে অপরকে প্রতিরোধ ও প্রতিহত করার ক্ষমতার উপর, অন্যের উপর প্রভাব খাটিয়ে। তিনি মনে করেন, চুক্তিবদ্ধ সমাজের মধ্যে দিয়ে প্রত্যেকের স্বার্থ রক্ষিত হবে এবং আত্মসংরক্ষণের মধ্য দিয়ে প্রতিটি সদস্য জীবন অতিবাহিত করবে। তাঁর বিশ্বাস ছিল সার্বভৌম কর্তৃত্বের পরিচালনায় এই সমাজে ক্ষমতার লড়াই বন্ধ হবে এবং মানুষ তার আকাঙ্খায় পৌঁছাতে পারবে। হবসের কাছে ক্ষমতার সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে মানুষের নিজের স্থির করা ভবিষ্যতের উদ্দেশ্য। তাকে সামনে রেখেই তিনি ক্ষমতাকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন। ব্যক্তির নিজ উপায় ও তার স্থির করা লক্ষ্যের মধ্যে পারস্পরিক খেলা চলে। এই দুয়ের মধ্যে সেতু রচনা করে দক্ষ কারণতা (efficient causality) অর্থাৎ হবস জোর দিয়েছেন ক্ষমতাশীল কর্তার সামর্থ্যের উপর। এই সামর্থ্য বিষয়ে হবস লেভিয়াথানে ক্ষমতার অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন বলা যায় দূরদর্শিতা, অস্বাভাবিক বল, বাক্‌পটুতা ইত্যাদিই হল ক্ষমতাশালী হওয়ার উপায়, এবং এগুলির বলে সে তার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারবে। হবসের মতে মানুষের ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করা যায় তাতে আরও নতুন গুণের উদ্ভব ঘটিয়ে। তাই বলা যায় ক্ষমতা হল সেই প্রবণতা যাতে রয়েছে আত্ম-উৎপাদক (self-productive) এবং আত্ম-উন্মেষক (self-generating) শক্তি। এখানে কর্তার সামর্থ্যই ব্যবহৃত হয় ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে। এই অর্থে ক্ষমতার ধারণাটি উপায় হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। আবার অন্যদিক থেকে দেখা যাচ্ছে ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়েই ক্ষমতাপ্রাপ্তি হচ্ছে বলে ক্ষমতা আবার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যেও পরিণত হচ্ছে। তবে

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.07

হবসের ক্ষমতা তত্ত্বে ক্ষমতা কোনো ভাবেই সামর্থ্যের দ্যোতক নয়, তা কর্তৃত্বের প্রকাশক। কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক নিয়ন্ত্রণের উপর গুরুত্ব আরোপ করলেও কে, কিভাবে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রয়োগ করবে এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট ভাবে দিতে পারেননি হবস। এসব প্রশ্নের উত্তর দিলেন জন লক।

হবসের জড়বাদী দর্শন লকের প্রস্থান বিন্দু (departure point)। ভাবধারার দিক থেকে লক অবশ্যই ফরাসি আলোক দীপ্তির যুগের অন্তঃসারকে গ্রহণ করেছিলেন। লক বস্তুতপক্ষে ইউরোপীয় উদারনীতির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। তার রাজনৈতিক তত্ত্বের মধ্যে তিনটি মৌলিক উপাদানের সন্ধান পাওয়া যায় যেগুলি পরম্পরাগত ভাবে উদারনৈতিক তত্ত্বের মূল উপাদান হিসাবে কাজ করেছে। প্রথমটি হল সম্মতির। লকের বিবেচনায় সম্মতি শুধুমাত্র সরকার প্রতিষ্ঠার সময় প্রয়োজনীয় এমন নয়, এটা একটি স্থায়ী শর্তও বটে। এই সম্মতি সরকারের প্রতি মানুষের আনুগত্যকে নিয়ন্ত্রণ করে। উদারনৈতিক তত্ত্বের দ্বিতীয় উপাদান হল সরকারকে কোনো ক্রমেই অনিয়ন্ত্রিত কর্তৃত্বের অধিকারী করে না তোলা। তাঁর মতে রাজনৈতিক ক্ষমতা সর্বদাই সুস্পষ্টভাবে বিবৃত উদ্দেশ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। সরকার যতক্ষণ পর্যন্ত এইসব উদ্দেশ্যাবলী বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করেছে ততক্ষণ পর্যন্ত তার আনুগত্য প্রদান করার অধিকার আছে। উদারনৈতিকতার তৃতীয় উপাদান হল এই যে ব্যক্তি মানুষের বিভিন্ন অধিকার রক্ষায় অত্যন্ত যত্নবান। সুতরাং লকের রাজনৈতিক তত্ত্ব উদারনীতিবাদের যাথার্থ্যকে প্রতিষ্ঠা করেছে।

ফরাসী প্রবুদ্ধকরণের অপর চিন্তাবিদ্ রুশোও উদারনীতির সমর্থক ছিলেন। আলোক দীপ্তির পর্বে দার্শনিকগণ যে যুক্তি অনুসরণ করার প্রবৃত্তিকে তাদের দিক নির্দেশক মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, রুশো তর্কাতীতভাবে সেই অনুভূতির সমর্থক ছিলেন। উদারনীতির ভাবধারায় ফ্রী এজেন্ট-এর ধারণা, মানুষের উপর আস্থা স্থাপন ইত্যাদি বিষয়েও রুশোর মতৈক্য লক্ষ করা যায়। *সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট* বা *সামাজিক চুক্তি* শীর্ষক তাঁর বিখ্যাত পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে তিনি দুঃখের সঙ্গে বলেছেন কিভাবে স্বাধীন হয়ে জন্ম লাভ করেও মানুষ সভ্যতার নানান বিধি-নিষেধের নিগড়ে বন্দি হয়ে আছে। *ডিস্কোর্স অন দি অরিজিন অফ ইনিকোয়ালিটি* (১৭৫৪) ও *এমিলি* (১৭৬২)-এই দুই গ্রন্থে তিনি সমসাময়িক সভ্যতাকে আক্রমণ করেন, বিজ্ঞান জ্ঞানচর্চা শিল্পকলা মানব উন্নতির এই সমস্ত স্থির সূচককে মানুষের প্রকৃত শত্রু বলে চিহ্নিত করেন। তার দৃষ্টিতে স্বাভাবিক মানুষ বা ন্যাচারাল ম্যান যার উপরে সভ্যতার পালিশ পড়েনি, সেই মানুষই মূলগতভাবে ভালো। সভ্যতার মধ্যেই ভীষণ রকমের ভন্ডামি আছে বলে তিনি মনে করেছিলেন। মানবিক জ্ঞানের উন্নতি এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবের ফলে শ্রমের শ্রেণীবিভাগ সূচিত হয় এবং মানব জাতির প্রাকৃতিক সুখকর অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে বিভাজন সৃষ্টি হয়। মানুষ বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্তির জন্য চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্র সৃষ্টি করতে উদ্যত হয়। তারা মনে করে সমাজে এমন

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.07

একটা আদর্শ থাকতে হবে যেখানে সমাজভুক্ত সকল ব্যক্তির জীবন ও সম্পদ সমাবেত শক্তির সাহায্যে নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকবে এবং প্রত্যেকে পরস্পরের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য অঙ্গিকারবদ্ধ হবে। এর ফলে সামাজিক চুক্তি বিকশিত হয়। এ চুক্তি কেনো নিরঙ্কুশ শাসক তৈরি করে না। প্রত্যেক ব্যক্তি তার সমস্ত অধিকারকে সামাজিক চুক্তির দ্বারা সমষ্টির নিকট সমর্পণ করে। আবার সকল নাগরিক একটা সার্বভৌম কাঠামোর সমান অধিকারী হিসাবে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার অধীনেও রয়েছে বলে নিজেকে সুনিশ্চিত হয়। প্রত্যেকে নিজেদেরকে সমর্পণ করবে অথচ ব্যক্তিগত ভাবে কারো কাছে নত না হয়ে। ক্ষমতা এখানে ব্যক্তিবিশেষের নয় পরস্পরের। মানুষ চুক্তির মাধ্যমে তার উপর আধিপত্য করার ক্ষমতা কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে দেয়নি। সমর্পণ করেছে 'সাধারণ ইচ্ছা'র কাছে। সেই ইচ্ছা অনুসারে একজন কাজ করবেন, সেই প্রতিশ্রুতিতেই জনগণ তাঁকে সিংহাসনে বসিয়েছে। চুক্তি লঙ্ঘণ করলে জনগণের পূর্ণ অধিকার আছে তাঁকে অপসারণ করে পুনরায় 'সাধারণের ইচ্ছা'কে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার। সমাজে এই সাধারণের ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব থাকায় তা সাধারণের স্বাধীনতার পরিপন্থী হয় না। এইভাবে সামাজিক চুক্তির ফলে শুধু যে সমাজ এবং সরকারের উদ্ভব ঘটে তা নয় বস্তুত পক্ষে চুক্তিই যৌথ সংস্থার জন্ম দেয় - যা একটি নৈতিক শক্তি। এই নৈতিক শক্তির নিকট আত্মসমর্পণে কোনোক্রমেই স্বাধীনতার বিলুপ্তি ঘটে না। বরং এটি স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত করে। তাই ব্যক্তির উপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। সাধারণের ইচ্ছাই রাষ্ট্রের সার্বভৌম যাবতীয় বৈধ ক্ষমতা। জনগণ এই সাধারণ ইচ্ছার কাছে সমর্পণ করে। রুশো সাধারণ ইচ্ছা কি নয় এটা বলতে যতটা আগ্রহী, সাধারণ ইচ্ছা বলতে ঠিক কী বোঝায় সেটা জানাবার ব্যাপারে ততটা আগ্রহী ছিলেন না। বস্তুতপক্ষে সাধারণের ইচ্ছেকে নৈর্ব্যক্তিক মান নির্ণয়ে তিনি ব্যর্থ হলেও সাধারণের ইচ্ছার ভিত্তিতে রুশোর মডেলটি আধুনিক বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সরকারসমূহ প্রতিষ্ঠা করে পশ্চিমী শাসন ব্যবস্থাকে সুনিশ্চিত করেছিল।

পাশ্চাত্য সমাজবিদ্যায় যে সকল বিষয়গুলো সাধারণত আলোচিত হয়ে থাকে তার মধ্যে ক্ষমতা বিষয়ক আলোচনা যে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নিয়েছে তা সহজেই বোঝা গেল। শুধু তাই নয়, ক্ষমতা বিষয়টি সমাজ বিজ্ঞান ও দর্শনে নানা দিক থেকে আলোচিত হওয়ায় তার মধ্যে থেকে ভিন্ন ভিন্ন ফলাফল এবং উল্লেখযোগ্য ও মূল্যবান পর্যবেক্ষণ পাওয়া গেছে। যেমন কোনো কোনো তাত্ত্বিকগণ ক্ষমতার নানান আকারগুলি নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন, আবার কেউ কেউ ক্ষমতার ভিত্তি নিয়ে বা তার সম্পদ রসদ নিয়ে আলোচনা করেছেন। আবার কেউ বা ক্ষমতার যে জটিল সম্পর্ক আছে তাকে কেন্দ্র করে তাদের গবেষণাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তাছাড়া এমন অনেক তাত্ত্বিক রয়েছেন যারা সমাজে ক্ষমতার ক্রমান্বয়ে পরিবর্তনকে চিহ্নিত করে ক্ষমতার আলোচনা করেছেন। বিন্যাস ও অনুশাসন দিয়ে ক্ষমতা কিরূপে ক্রমাগত বিষয় নির্মাণ করে চলেছে তাও ক্ষমতা তত্ত্বে আলোচিত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ক্ষমতাকে কেন্দ্র

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.07

করে মূলত দু'রকমের আলোচনা লক্ষ করা গেল; এই দুই মেরুর মধ্যের পার্থক্যটি যে শব্দযুগলের দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে তা হল "power over" এবং "power to"। বিংশ শতাব্দীর প্রাক্ ইতিহাস নিঃসন্দেহে আগ্রাসনী ক্ষমতা তত্ত্বকেই প্রকাশ করেছে তা আমরা ক্ষমতার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটেই দেখলাম। আধুনিক যুগের পাশ্চাত্য ক্ষমতা তত্ত্বেও ক্ষমতার যে মডেলটি সর্বাধিক জোরালো রূপ ধারণ করেছে তা হল আধিপত্যকারী ক্ষমতা বা "power over" এর অভিব্যক্তিটি। যদিও "power to" –এর মডেলটি পদার্থবিদ্যা ও প্রকৃতি বিজ্ঞানে পরিলক্ষিত হয়, তথাপি পাওয়ার ওভারের ধারণা থেকে সামাজিক দ্বন্দ্ব, নিয়ন্ত্রণ, সংঘাত ইত্যাদি সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রত্যয়গুলি তাত্ত্বিকদের প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। এখনো পর্যন্ত আমরা যত প্রকারের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক তত্ত্ব পেয়েছি প্রত্যেকটি তত্ত্বই কোনো না কোনোভাবে ক্ষমতার আধিপত্যকারী রূপেরই নামান্তর। আমেরিকায় যে কমিউনিটি ডিবেট বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে হয়েছিল, সেই সময়ে যে তত্ত্বগুলি দক্ষতা ও দাপটের সঙ্গে চালু ছিল সেগুলি হল- রবার্ট ডাল, বাখরাখ্ এবং বারাটাজ্, স্টিভেন লুক, গিডেন্স প্রমুখের তত্ত্ব।

আমাদের কাছে যতপ্রকার ক্ষমতার ধারণা রয়েছে তাকে সমাজ ও রাষ্ট্র বিজ্ঞানে নানাভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে তিন ধরণের ক্ষমতা তত্ত্বের ব্যাখ্যা লক্ষ করা গেছে, যেগুলি মূলত এইপ্রকার -

(১) একমাত্রিক ক্ষমতার ধারণা
(২) দ্বিমাত্রিক ক্ষমতার ধারণা
(৩) ত্রিমাত্রিক ক্ষমতার ধারণা

সংক্ষেপে বুঝে নেওয়া যাক বিষয়গুলি।

(১) একমাত্রিক ক্ষমতার ধারণা - রবার্ট ডাল, ক্ষমতার একটি সহজিয়া ব্যাখ্যা দেন। তাঁর তত্ত্বটি সহজ আচরণগত ক্ষমতা তত্ত্ব। এই প্রকারটি সাধারণত বহুত্ববাদী/ নানাত্ববাদী ক্ষমতাতত্ত্ব বলেও অভিহিত করা হয়। যদিও তা বিভ্রান্তিমূলক কারণ কোনো মতবাদকে বহুত্ববাদী বলে তকমা দিলে স্বভাবতই মনে করা হয় যে এই তত্ত্বে বা তার সিদ্ধান্তে বা তার বক্তব্যের মধ্যে অনেকগুলি মাত্রা রয়েছে। কিন্তু এই তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এতে আদৌ কোনো বহুমাত্রিকতা নেই, বরং এটি একমাত্রিক। ডালের মতে ক্ষমতা তত্ত্বের কেন্দ্রিয় সমস্যা হল কে কর্তৃত্ব ফলাচ্ছে (who governs?)। তাৎপর্য হল কার অংশগ্রহণ বা কার সিদ্ধান্তকেই চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করা হবে (অন্যের প্রদত্ত বিকল্পকে ভেটো দেওয়া বা প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতা ইত্যাদি যার আছে)। এইসকল ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে নির্ধারিত হয় ব্যক্তির সাফলতা ও বিফলতা। ডাল-র মতে প্রভাবশালী বা প্রতাপশালী তাকেই বলা যায় যে সর্বশ্রেষ্ঠ সাফল্য অর্জন করেছে। এর প্রসঙ্গে পলস্বি বলেছেন - 'In the pluralist approach... an attempt is made to study

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.07

specific outcomes in order to determine who actually prevails in community decision making.'[iv] অর্থাৎ এক্ষেত্রে যেটির উপর জোড় দেওয়া হয় তা হল মূর্ত পর্যবেক্ষনীয় আচরণ বা যার প্রভাব আছে অর্থাৎ ক্ষমতা আছে। বস্তুত এই আচরণ নিহিত আছে সিদ্ধান্ত-গঠন-নেওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে। ডাল মনে করেন ক্ষমতাকে বিশ্লেষণ করলে মূর্ত সিদ্ধান্তের একটি দীর্ঘ পর্যায়ক্রম বা শৃঙ্খলা দেখা যাবে - '...careful examination of a series of concrete decisions.'[v]। পলস্‌বি বলেছেন যে 'power', 'influence', 'control' এগুলি সবই পর্যায় শব্দ, যার অর্থ হল একজনের আচরণ বা কর্ম, যা অপরের কর্মকে প্রভাবিত করার সামর্থ্য রাখে অর্থাৎ "A" নিজের কর্তৃত্ব-বলে "B"-কে এমনভাবে চালনা করবে যাতে "A"-এর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং স্বার্থ "B"-এর দ্বারা চরিতার্থ হয়। ক্ষমতার প্রত্যক্ষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয় সিদ্ধান্ত নির্মাণ স্তরে, অর্থাৎ সিদ্ধান্ত নির্মাণ প্রক্রিয়াকে চালনা করার মানেই হল কোন গোষ্ঠীর লোকেদের উপর নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সুতরাং এটা খুব ভালো বোঝা যাচ্ছে যে চালনা কে করবে তা নির্ভর করে সাফল্যের উপর। তাছাড়া ডাল-র মতে দ্বন্দ্ব-বিরোধ হল ক্ষমতাকে বোঝার একমাত্র উপায়। দ্বন্দ্ব ছাড়া ক্ষমতার অস্তিত্বকে বোঝা যায় না, এমন কি তা না থাকলে ক্ষমতার প্রয়োগ বিষয়টি নস্যাৎ হয়ে যায়। কিন্তু এই স্থলে প্রশ্ন হল বিরোধ বা দ্বন্দ্ব কিসের মধ্যে? এর উত্তর হল কোন জিনিষটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাবে পছন্দের, তার ভিত্তিতেই পছন্দকে অগ্রাধিকার দেওয়া নিয়ে বিরোধ উপস্থিত হয়। এই পছন্দগুলি নীতি (policy)-কে কেন্দ্র করে বিরোধ সংগঠিত হয়। অর্থাৎ ইচ্ছার দ্বন্দ্বগুলি আদপে হয়ে যায় পছন্দের দ্বন্দ্ব। মূলত একমুখী ক্ষমতা তত্ত্বে, বিশেষ করে রাজনৈতিক পছন্দের নীতিকে প্রতিষ্ঠা করার স্বার্থে যেমন সিদ্ধান্ত- নির্মাণের উপর জোড় দেওয়া হয় তেমনই সিদ্ধান্ত-গ্রহণ প্রসঙ্গে যে সে মতান্তর-দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় তাকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়।

একমাত্রিক ক্ষমতা তত্ত্বে অংশগ্রহণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্ষমতার ব্যক্ত রূপটি প্রকাশ পায়। সুতরাং সমাজের একদল ব্যক্তি তারা অন্যের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্রিয় দায়িত্ব নেয়। এর ফলে বহু ব্যক্তি সমাজে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে বা তাদেরকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়। সুতরাং অবদমিত শ্রেণীকে নিশ্চল করে রাখার সুযোগ এই ক্ষমতা তত্ত্বে নিশ্চিত ভাবে আছে এবং যারা অংশগ্রহণ করছে না, যারা নিশ্চল হয়ে আছে তাদের জীবন সংস্কৃতিতে এই নিষ্ক্রিয়তাকে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়।

(২) দ্বিমাত্রিক ক্ষমতার ধারণা- রর্বাট ডালের একমাত্রিক ক্ষমতা তত্ত্বের সমালোচনা করে বাখরাখ্ এবং বারাটাজ্ তাঁদের "the two faces of power" তত্ত্বটিকে দাঁড় করান। তাঁরা ক্ষমতার দুটি দিকের উল্লেখ করেন। একটি বাহ্যিক দিক এবং অপরটি হল অভ্যন্তরীন দিক। এই তত্ত্বের মাধ্যমে ডালের পূর্ব স্বীকৃতিটিকেই তাঁরা চ্যালেঞ্জ জানায়। সমাজের নানা ধরনের প্রয়োজন, চাহিদাগুলি একটি মুক্ত প্রক্রিয়ায় সংগঠিত হয় কিন্তু বাখরাখ্ এবং বারাটাজ্ সংশয় প্রকাশ করে

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.07

বলেন যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াটি কি আদৌ গণতান্ত্রিক ও মুক্ত? এ প্রসঙ্গে তাঁরা ক্ষমতার প্রকট রূপ এবং প্রচ্ছন্ন রূপের মধ্যে সম্পর্ক কি তা আলোচনা করেন। ক্ষমতার প্রকটরূপ হল যেভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় আর ক্ষমতার প্রচ্ছন্ন রূপ হল সেই সামর্থ্য যার দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়াকে নিবৃত্ত করা হয়। তাঁরা সেই পক্ষপাতমূলক কৌশলগুলিকে নির্দেশ করেন যেগুলি আলোচনাকে প্রতিহত করে এবং যার ফলে কোনগুলি আলোচনায় গুরুত্বহীন বা গুরুত্বপূর্ণ তা নির্ধারিত হয়। এই প্রকার সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁরা বলেন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতিতে কি অন্তর্ভুক্ত হবে আর কি বাদ যাবে সেটি একটি অ-সিদ্ধান্ত গঠন ক্রিয়া, যেখানে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব জনগণের উর্ধ্বে উঠে যায় না অর্থাৎ সীমিত থাকে বিশেষ কতগুলি বিশ্বাস এবং আচার বিধির মধ্যে, যেগুলি আবার একটি বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থ গোষ্ঠীর তুলনায় অধিক গুরুত্ব দেয়। তাৎপর্য হল একদিকে ক্ষমতাকে তাঁরা সাধারণ অর্থেই প্রয়োগ করেছেন, তা হল যে কোন প্রকারের আধিপত্যকে কায়েম করা এবং তাকে সাফল্যের সঙ্গে টিকিয়ে রাখা। অর্থাৎ A, B-এর সম্মতিকে নিজের দিকে সুরক্ষিত করে নেয়। তার মানে B-এর উপর কর্তৃত্ব বহাল রাখে। অন্যদিকে রয়েছে ক্ষমতার হিংসাত্মক দিক। সেখানে B-এর সম্মতিকে জোড়ের সঙ্গে, ভয়ের সঙ্গে রক্ষিত করা। সুতরাং বলপূর্বক ক্ষমতাকে জাহির করা ও কায়েম করা, এই দুই দিকই ক্ষমতার এক্তিয়ারের মধ্যে পরে। তবে সবই কি জনস্বার্থে প্রয়োগ করা হয়। বাখরাখ্ এবং বারাটাজ্ বলেছেন - ক্ষমতার আস্ফালন মূলক চেহারাটি অতি সুক্ষ ভাবে কার্যকরী হয়।

(৩) **ত্রিমাত্রিক ক্ষমতার ধারণা** - বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে, স্টিভেন লুক দ্বিমাত্রিক তত্ত্বকাঠামোর সঙ্গে যুক্ত করেন আর একটি দিক। আমরা পূর্বের তত্ত্বকাঠামোতে লক্ষ করেছি যে ক্ষমতা রাজনৈতিক পরিসরেই কেবল প্রকাশিত হয়। রাজনৈতিক স্বার্থ যেমন থাকে তেমনই তার সঙ্গে যুক্ত থাকে অ-রাজনৈতিক দিকগুলি। আমরা জানি যে ক্ষমতার প্রকট রূপ হল ঘোষিত রাজনৈতিক পছন্দের সরাসরি ব্যক্তকরণ এবং ক্ষমতার প্রচ্ছন্ন রূপ হল কতগুলি রাজনীতি বহির্ভূত বিষয়ের উপর আক্রমণ করে বিশেষ কিছু রাজনৈতিক পছন্দকে সামনে নিয়ে আসা। তৃতীয় মাত্রিকতায় লুক বলেছেন এটি হল রাজনৈতিক পছন্দ ও প্রকৃত পছন্দের বা স্বার্থের সম্বন্ধ। লুকের মতে, ক্ষমতা পরিমাপ করার জন্য ব্যক্তিমনে এমন কিছু স্বার্থের বীজ বপন করা হয় যা ব্যক্তির প্রকৃত কল্যাণ বা স্বার্থের বিরোধী। এইভাবে স্বার্থের বীজ বপন করার সামর্থ্যের দ্বারা এই ক্ষমতার সুপ্ত দিককে পরিমাপ করা হয়। এই তৃতীয় মাত্রাটি চিহ্নিত করা সবচেয়ে কঠিন। কারণ যে ব্যক্তি এই মাত্রার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আছেন তার পক্ষে এটির অস্তিত্ব আবিষ্কার করা খুবই শক্ত। ক্ষমতার বিশ্লেষণের সঙ্গে এই তৃতীয় মাত্রাকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং তা যদি না করা হয় তবে বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর প্রকৃত স্বার্থ রক্ষায় রাজনৈতিক এজেন্ডার সামগ্রিক পর্যাপ্ততা পরীক্ষা করা যাবে না।

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.07

লুক যে তৃতীয় মাত্রাটিকে সংযোজন করেছেন তা হল রাজনৈতিক স্বার্থ ও বাস্তব স্বার্থের মধ্যে সম্পর্কটি ঠিক কি তার ভিত্তিতে তাকে তুলে ধরা। বস্তুতপক্ষে লুকের মতে উপরোক্ত দুটি মতবাদ খুবই সরল। তার মধ্যে ক্ষমতা যখন অপরের উপর ফলানো হয় বা ক্ষমতাকে যখন অপরের উপর কার্যকর করানো হয়, তখন আসলে তাদের পরিচয়, তাদের সত্তাকে, তাদের চাহিদা গুলোকে প্রতিহত করা হয়। অর্থাৎ তাদের নিজস্বতা সব দিক থেকে, তার সমগ্র জীবন চাহিদা সব কিছুতেই নানা উপায়ে ক্ষমতা বলে প্রতিহত করা হয়। অন্য ভাষায় মার্ক্স-এঙ্গেলস যাকে বলেছেন ক্ষমতা কার্যকরী হয় মিথ্যা চেতনার (false consciousness[vi]) প্রতি পালনের মাধ্যমে; গ্রামশি একেই যাকে বলেছেন কর্তৃত্ব (hegemony)।

ক্ষমতা সংক্রান্ত যত আলোচনা পূর্বে করা হল তা একমাত্রিক, দ্বিমাত্রিক বা তিন মাত্রিক, যাই হোক না কেন প্রত্যেক ব্যাখ্যার অন্তঃস্রোতে যে প্রবাহ চলছে তা হল ক্ষমতার আস্ফালনমূলক চর্চা বা অনুশীলনের মাত্রাটি। আপাতভাবে এদের প্রত্যেককে অপরের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও প্রত্যেকটিতেই ক্ষমতার ‘power-over’ মডেলটি তাদের আলোচনায় সীমাবদ্ধ ছিল। তবে এই আলোচনাগুলির গুরুত্ব এইখানেই যে, এর প্রতি তুলনায় যে ‘power-to’ এর মডেলটি উঠে আসে তাকে বুঝতে অসুবিধা হয় না। লুক এর পাশাপাশি আরো বলেছেন যে সমাজ ও রাষ্ট্রনৈতিক পরিসরে পাওয়ার টু-এর মডেলটি তাত্ত্বিক বা ধারণাগত দিক থেকে অপেক্ষাকৃত কম আলোচিত। এর পিছনে দুটি কারণ হল যে ক্ষমতাকে যদি আমরা পাওয়ার টু এর দ্বারা বুঝি তবে ক্ষমতার যে অন্যের উপর কর্তৃত্বকারী চেহারা আছে তা ঢাকা পড়ে যাবে। কিন্তু এই দিকটি ক্ষমতার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক। একই রকম মন্তব্য করেন আরও অনেক সমাজতাত্ত্বিক, যেমন ওয়ারটেনবর্গ। তিনি বলেছেন পাওয়ার ওভার এই অর্থটি ক্ষমতার প্রাথমিক অর্থ। তাঁর বক্তব্য হল ক্ষমতাকে যদি আমরা পাওয়ার টু এর অর্থে গ্রহণ করি তাহলে সমাজে অ-আইনানুগ ঘটনা বা বৈষম্য, অসাম্যের বাতাবরণ যে আছে তাকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে না। তাছাড়া ফুকো যিনি ক্ষমতার প্রকৃতি ও তার কার্যকারিতাকে নতুন করে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তিনিও ক্ষমতার উর্ধ্বস্থিতির দাবিটিকে অস্বীকার করতে পারেননি।

ক্ষমতার কর্তৃত্বকারী রূপটি যদিও সব ক্ষেত্রে বহুলভাবে চর্চিত এবং আলোচিত, তথাপি ক্ষমতার অন্য আরেকটি ঘরাণারও সন্ধান পাওয়া যায়; যেমন অ্যানটানিও গিডেন্স-এর তত্ত্বে। তাঁর মতে, ক্ষমতা হল রূপান্তরিত সামর্থ্য বা ধারকতা বা একটা কোনো কিছুকে লাভ করতে পারার সামর্থ্য। এটি একটি প্রকারের পাওয়ার টু’র সংজ্ঞা। তাঁর লেখায় আমরা ক্ষমতাকে সংঘাতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আলোচিত হতে দেখেছি, কিন্তু তিনি আবার এও বলেছেন যে ক্ষমতা আবশ্যিকভাবে বিরোধ বিবাদের সঙ্গে যুক্ত নয় এবং ক্ষমতা মজ্জাগতভাবে দমনমূলক নয়। তাঁর মতে, ক্ষমতা থাকে পরস্পরের মধ্যে এবং যেখানে ক্ষমতার বন্টন সমানভাবে হয়নি সেখানে ক্ষমতা দমনমূলক নাও

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.07

হতে পারে। ক্ষমতা মাত্রই তা দমনমূলক হবে, তার কোনো মানে নেই, যেমন- অভিভাবক ও সন্তানের মধ্যে সম্পর্ক। যদিও এমতের অন্যথা আমরা বাস্তবে দেখতে পাই। পারিবারিক ভাবে ক্ষমতার অসাম্যতার চেহারা কীরূপ হতে পারে তা রবীন্দ্রনাথ তাঁর "পারিবারিক দাসত্ব" নামক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন এবং বহু নারীবাদীও এমনটাই মনে করেন। তবে, গিডেন্স বলেছেন তাতে ক্ষমতার অসম বন্টন থাকলেও তা ক্ষমতায়নের জনক হতে পারে। এই প্রকার চিন্তার সার্বিক প্রকাশ লক্ষ করা যায় নারীবাদী ক্ষমতা তত্ত্বে এবং বেশকিছু শান্তি বিষয়ক গবেষকদের মধ্যে।

আমাদের কাছে ক্ষমতাকে সংজ্ঞায়িত করা বিষয়টি একটি অত্যন্ত জটিল কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ আরও বিভিন্ন ব্যাখ্যা ইতিহাসে উঠে এসেছে এবং আসছে। যেমন- হানা পিটকিম-এর মতে ক্ষমতা অর্থাৎ 'Power' এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ফরাসী শব্দ *pouvoir* এবং ল্যাটিন শব্দ *potere* থেকে এসেছে। যার অর্থ হল কোন কিছু সম্পাদন করার সামর্থ্য। ঠিক একইভাবে পিটার মরিস (২০০২) এবং লুক (২০০৫) উভয়েই ক্ষমতাকে একপ্রকার স্বাভাবিক প্রবণতা (dispositional concept) বলে বুঝেছেন, সেইমত গড়ে তুলেছেন তাঁদের ক্ষমতা সংক্রান্তীয় তত্ত্ব। লুকের অভিমত হল ক্ষমতা হল একপ্রকার সম্ভাবনা, কোন বাস্তব অবস্থা নয়। প্রকৃতপক্ষে এই সম্ভাবনা হল, যাকে কখনই বাস্তবায়িত করা হবে না। এইপ্রকার বিবৃতি লুকের সংশোধিত অবস্থান। কারণ তিনি পূর্বে ক্ষমতাকে অপরের উপর খবরদারী বা কায়েম (power over) অর্থে বুঝেছিলেন, পরবর্তীতে তিনি সেই অবস্থান থেকে সংশোধিত করে প্রাগুক্ত অবস্থানটি গ্রহণ করেন। আবার কোন কোন দার্শনিক ক্ষমতার সামর্থ্য (to able) অর্থটিকেই মেনে নিয়েছেন সর্বতোভাবে। হানা আরেন্ট বলেছেন ক্ষমতা হল - "the human ability not just to act but to act in concert"[vii], অর্থাৎ তার ক্ষমতা তত্ত্ব শুধু এককের কর্মকান্ড নয়, ক্ষমতা হল সমবেতর কর্মকান্ড। যেমনভাবে কোন সঙ্গীতানুষ্ঠানে নানারকমের বাদ্যযন্ত্র একত্রে সুর মূর্ছনা তৈরী করে ঠিক তেমনই ক্ষমতাও বহুর মিলিত একটি প্রয়াস। তিনি প্রথমেই ক্ষমতাকে কর্তৃত্ব, দমন, শক্তি, জোড়খাটানো, অত্যাচার প্রভৃতি থেকে পৃথক করেছেন। তাছাড়া তিনি ক্ষমতাকে স্বলক্ষ্যাভিমুখী (end in itself) এক আর্দশগত ধারণা বলে স্বীকার করেন। তাঁর মতে, মানুষে মানুষে মিলনের মধ্যে থেকে ক্ষমতার স্ফূরণ ঘটে। সুতরাং মানুষের মধ্যে ক্ষমতার উন্মেষ ঘটে যখন তারা একসঙ্গে কাজ করে, আর ক্ষমতা অদৃশ্য হয়ে যায় যখন মানুষগুলি সম্পর্কচ্যুত হয়ে যায়। ক্ষমতার আদেশ-বাধ্যতার মডেল ক্ষমতাকে সংজ্ঞায়িত করেননি, তাঁর মতে ক্ষমতা হল "Power corresponds to the human ability not just to act but to act in concert. Power is never the property of an individual; it belongs to a group and remains in existence only so long as the group keeps together."[viii]। আরেন্ট ক্ষমতা ধারণাটিকে নিঃসন্দেহে ক্ষমতায়ন হিসাবেই বুঝতে চেয়েছেন। কারণ তাঁর এই মনন সম্প্রদায়গত ও সমষ্টিগত ক্ষমতায়নের কথা বলে। অন্যদিকে মেরি পার্কার ফোলে এর

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.07

কাজেও ক্ষমতায়নের ইঙ্গিত পাওয়া যায় এবং তিনি power-over এবং power-with এর মধ্যে পার্থক্য করে বলেছেন power-with হল যূথবদ্ধ সামর্থ্য, যেটি গোষ্ঠীর সদস্যের মধ্যে আদান-প্রদানের সম্পর্কের মাধ্যমে কার্যকরী হয়, যা অনেক বেশি উদার ও উন্মুক্ত ক্ষমতাকে নির্দেশ করে। তাহলে আমাদের কি উচিত নয় অত্যাচারী আস্ফালনধর্মী ক্ষমতার তত্ত্ব কাঠামোর কবল থেকে বেড়িয়ে গিয়ে মুক্তি ও স্বাধীনতাকামী সামগ্রিক মর্যাদাজ্ঞাপক ক্ষমতা কাঠামোর অনুসন্ধান করা?

তথ্যসূত্র

1. Thomas Hobbes, *Leviathan,* London J, M. Dent & Sons Ltd Newyork E.P. Dut'fon & Coinc, 1914.
2. Thomas Hobbes, *Leviathan,* London J, M. Dent & Sons Ltd Newyork E.P. Dut'fon & Coinc, 1914, p: 43.
3. If any two men desire the same thing, which nevertheless they cannot both enjoy, they become enemies; and in the way to their end (which is principally their conversation and sometimes their delectation only), endeavor to destroy, or subdue one another" -- Thomas Hobbes, *Leviathan*, London J, M. Dent & Sons Ltd New York E.P. Dut'fon & Coinc, 1914, p: 63
4. N. W. Polsby, *Community Power and Political Theory*, Yale University Press, 1963, p: 113.
5. Steven Luke, *Power: A Radical View*, British Sociological Association, 1974, p: 17.
6. Steven Luke, *Power: A Radical View*, British Sociological Association, 1974, p: 19.
7. Arendt, Hannah, *The Human Condition*, Chicago: University of Chicago Press, 1958.
8. Guido Parietti, "Arendt on Power and Violence", *The Anthem Companion to Hannah Arendt*, eds. Peter Baehr, and Philip Walsh, New Delhi: Anthem Press, 2017.

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore